উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল বিস্তৃতিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আজ যেমন এক সুপরিচিত নাম তেমনি একথাও সত্য যে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজের এক বৃহত্তর অংশের কাছে আজও তিনি এক অপরিচিত লেখক । তিনি তথাকথিত জনপ্রিয় সাহিত্যিক নন । একই গ্রন্থের বহু সংস্করণ তো দূরের কথা তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'লালসালু'-র প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত দু'হাজার কপির মধ্যে মাত্র দু'একশ কপি বিক্রি হয়েছিল। বাকি কপিগুলো বাঁধাইখানার লোকজন সের দরে বিক্রি করে দেয় । তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলোও সমকালে খুব বেশি লোকপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি । তাই 'যুগন্ধর কথাসাহিত্যিক', 'দরদী কথাশিল্পী' বা 'বহু আলোচিত লেখক' এসব বিশেষণের কোনটাতেই তিনি অভিহিত হননি । তিনি যেমন অনেকদিন ধরে লেখেন নি তেমনি তাঁর লেখার সংখ্যাও অনেক নয় । তিনি লোকপ্রিয় কোন বিষয় যেমন -পরিচিত রোমান্সমূলক ত্রিভুজ প্রেমকাহিনির বিচিত্র দ্বন্দ্ব বা বাংলা উপন্যাস গল্পের চিত্তাকর্ষক ঐতিহ্যধর্মী লেখা একটাও লেখেননি । সেসব বিষয়ে তাঁর কোন উৎসাহও ছিল না । তিনি লিখেছেন খুব স্বল্প । এত স্বল্প সংখ্যক লেখা শুধু সেকালে নয় একালেও কোন বাঙালী লেখকের নেই । ব্যক্তিজীবনে তিনি যেমন অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিলেন তেমনি নিজের লেখা সম্পর্কেও ছিলেন নীরব । কারণ তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন অনেক লিখলেই তা লেখা হয়ে ওঠে না । বরং অজস্র লেখার ফলে অধিকাংশ লেখাই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে বাজে লেখা ।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে তবে কোন্ বিশেষত্বের কারণে তিনি এত স্বল্প সংখ্যক রচনাবলীর অধিকারী হয়েও বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছেন । এর উত্তর নিহিত রয়েছে তাঁর সাহিত্যে । পূর্বেই বলা হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের লিখিত সাহিত্যের পরিমাণ খুব স্বল্প। (যদিও যে কোন সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্রে সংখ্যা দিয়ে তার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়) তাঁর সেই স্বল্প সংখ্যক সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে 'লালসালু','চাঁদের অমাবস্যা','কাঁদো নদী কাঁদো' নামক তিনটি উপন্যাস, 'বহিপীর', 'সুড়ঙ্গ', 'তরঙ্গভঙ্গ' নামক তিনটি নাটক, 'নয়নচারা', 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' নামক দুটি গল্পগ্রন্থ, 'কদর্য এশীয়','হাউ ডাস ওয়ান কুক বিনস্' নামক একটি ইংরেজি উপন্যাস ও একটি রম্য রচনা । এছাড়া রয়েছে 'ডেথ

আপস্ট্রীম' নামক ইংরেজি একাঙ্ক নাটক,কিছু প্রবন্ধ এবং ৩৪টির মত অপ্রকাশিত গল্প । তাঁর এ সমস্ত লেখার মধ্য দিয়েই তিনি অনবরত জীবনের কথা বলে গেছেন । কারণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মূলত একজন জীবনের শিল্পী ।জীবনকেই তিনি ভালোবেসেছেন বারবার । মানব জীবনের রসমাধুর্যকে, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি অনুভব করতে চেয়েছেন । একারণে তাঁর গল্প, উপন্যাসের চরিত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উঠে এসেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে । ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সেই সকল চরিত্রের সকলকেই আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ বলে প্রতিভাত হয় ।যারা তাদের হিংসা, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা, নীচতা, অশ্লীলতা এবং যৌনতা নিয়ে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজমান । তাদের প্রায় প্রত্যেকেই বেঁচে থাকার ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত । একজন মানুষের বেঁচে থাকার যে প্রধান উপাদান-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শরীর -এর সমস্ত কিছুই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের রচনায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । 'লালসালুর'-র মজিদ কোন এক অচেনা অজানা কবরের ওপর লাল সালু বিছিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র জীবনে বেঁচে থাকার তাড়নায় । ক্ষুধার ফাঁদ তাকে এই প্রতারণার পথে নামতে প্ররোচিত করেছে । তার বিছানো সেই রঙিন সালুর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে এক ব্যর্থ মানুষের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এবং জীবনের অনন্ত চাহিদার কথা ।

আবার 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে উঠে এসেছে এক যুবতী নারীর চিত্র, অবৈধ প্রেমের চিত্র, সেই যুবতী নারীকে হত্যার চিত্র এবং এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরেফ আলী নামক এক যুবক শিক্ষকের নিজের অস্তিত্বকে খোঁজার চিত্র । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'লালসালু' এবং 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাস দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রচনা ।'লালসালু' উপন্যাসে লেখক গ্রামীণ বাংলাদেশের স্থির হয়ে থাকা এক সমাজ ভিত্তিক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন । যেখানে মজিদ খালেক ব্যাপারিকে হাতিয়ার করে নতুন করে এক পিউরিটান যুগের সূচনা করতে চায় ।'লালসালুর' মহব্বতনগর শিক্ষা-দীক্ষাহীন,কুসংস্কারময় ধর্মবোধে অন্ধ এবং সর্বোপরি নিয়তি নির্ভর ।অন্যদিকে 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের গ্রাম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মহব্বতনগর থেকে এগিয়ে গেছে ।তাই আরেফ আলীর মধ্য দিয়ে আধাসামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণজীবনে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভবকে দেখিয়েছেন লেখক । দেখিয়েছেন অসহায় দারিদ্রের তাড়নাতেই করিম মাঝি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় ।'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মূলত আরেফ আলীর চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গেলেও বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের প্রথম থেকে ষাটের দশকের প্রথমার্ধের সমাজ জীবনকে প্রত্যক্ষ

করাতে গিয়ে উপস্থিত করেছেন ভূমিহীন নিরুদ্দেশ করিম মাঝিকে। উপন্যাসে করিম মাঝির পরিচয় আমরা এভাবে পাই-

''সে লম্বা পাড়িতে ঘরছাড়া ।ঘরে বিধবা মা, চোখে কম দেখে, বাতের ব্যথায় সব সময়ে গোঙায় ।তার অবিবাহিত মেয়েও ঘরে । কানা, বিয়ে হবে না । বাড়ির পেছনে পুকুর, নদীটাও কাছে ।দুটি গরু, একটি ছাগল, উঠানের কোণে মোরগ-মুরগীর খাঁচা । মাঝি বড় গতর খেটে কাজ করে ।''[১]

বস্তুত করিম মাঝির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থানটা প্রত্যক্ষ করে দিয়ে ঔপন্যাসিক দারিদ্রের অসহায়তাকেই দৃশ্যমান করেন । সীমাহীন দারিদ্রের কারণেই আরেফ আলীকে পড়াশোনা বন্ধ করে খুঁজে নিতে হয় অর্থ উপার্জনের রাস্তা । দারিদ্রের কারনেই করিম মাঝির স্ত্রী ব্যভিচারী হতে বাধ্য হয় । যার পরিণতিতে তাকে খুন হতে হয় এবং সেই খুনের কোন বিচার হয় না । তাই সমগ্র উপন্যাসে অন্যতম নারী চরিত্র হিসেবে যাকে আমরা পাই সে মৃত! সেই মৃত রমণীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনিমালা, আরেফ আলীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রসঙ্গ, কাদেরের মতো একজন নিষ্ঠুর কদর্য মানুষের ছবি, দাদাসাহেবের মতো ধর্মের মোড়কে আচ্ছাদিত সামন্ত-তন্ত্রের নগ্ন ধ্বজাধারীর প্রসঙ্গ ।আসলে একটি মৃত্যুর পেছনে ষোলটি পরিচ্ছেদ ধরে ছুটতে ছুটতে যুবক শিক্ষকের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক প্রকারান্তরে যেন আমাদেরও বুঝিয়ে দিয়েছেন 'মানুষের জীবন এত মূল্যহীন নয় ।' এর পাশাপাশি আমরা আরও এক উত্তরণের কথা পাই । 'লালসালু' উপন্যাসে আক্কাস সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মের কুহকে সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি ।আর আরেফ আলী সেই স্কুলের শিক্ষক যে স্কুল নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা । উপন্যাসে আমরা পাই আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের প্রসঙ্গ ও তার বাস্তব অবস্থার চিত্র-

''দরিদ্র যুবক শিক্ষক, কোপন নদীর ধারে ক্ষুদ্র চাঁদপারা গ্রামে তার জন্ম । কষ্টেসৃষ্টে নিকটে জেলা শহরে গিয়ে আই. এ. পাস করেছে, সুপরিচিত নদী-খাল-বিল ডোবা-মাঠ-ঘাট সুদূরপ্রসারী ধান ফসলের ক্ষেতের বাইরে কখনো যায় নাই ।সমতল বাংলাদেশের অধিবাসী, পর্বতমালা কখনো দেখে নাই । বই-পুস্তকে, সাময়িক পত্রিকা সংবাদপত্রে কোনো কোনো

পর্বতের শুধু নামই শুনেছে ।এন্ডিজ, উরাল, ককেসিয়ান আলতাই পর্বতমালা ।কত নাম ।সব স্বপ্নের মতো শোনায় ।.....হিমালয় সে দেখে নাই ।বস্তুত , সে কিছুই দেখে নাই ।দরিদ্র শিক্ষক, কিছুই তার দেখার সৌভাগ্য হয় নাই ।.....দু বছর আগে আরেফ আলী শিক্ষক হয়ে এ গ্রামে আসে ।....ইস্কুলটি এখনো উচ্চ ইস্কুলে পরিণত হয় নাই বটে তবু নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ-অধ্যয়নের দরজা খোলা হয়েছে । আশা এই যে, দু-এক বছরের মধ্যে সর্বশেষ শ্রেণীও খোলা সম্ভব হবে । সরকারি অর্থ-সাহায্যের জন্যে যথাযথ আর্জি পেশ করা হয়েছে ।শীঘ্র সে সাহায্যও পাওয়া যাবে সকলের ভরসা ।বড়বাড়ির উদ্যম ও আর্থিক সাহায্যে এ-ইস্কুলের পত্তন পড়ে । ’’[২]

লেখকের এ বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনে মানুষের এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বিবিধ রূপকেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তুলে ধরেছেন । ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় শিক্ষিত পরনির্ভর যুবক আরেফ আলী মজিদের মতো জীর্ণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আপন অস্তিত্ব রক্ষার কারণে শেষ পর্যন্ত সত্য থেকে বিচ্যুত হয়নি । শিক্ষিত মানুষের চেতনালোকের পরিবর্তনের, নিজের ক্ষতিসাধন করেও ব্যক্তিচৈতন্যের যে ইঙ্গিত লেখক আরেফ আলীর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন , তা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক । পাশাপাশি নাগরিক মানসিকতার গলিপথে যে কপটতার জন্ম তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা সম্ভব পুলিশ ও কাছারির মধ্যে ।কারণ এই উপন্যাসে পুলিশ প্রশাসন শেষ পর্যন্ত সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীর কাছে মাথা নত করেছে । তাই সমস্ত ঘটনার পিছনে দোষী হিসেবে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে আরেফ আলীকেই। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এমন একজন লেখক যিনি শুধু সমস্যার কথাই তুলে ধরেন না। একই সঙ্গে তুলে ধরেন সমাধানের পথও, যে পথ ধর্মীয় গোড়ামি এবং অশিক্ষা থেকে মুক্ত। তাই ‘লালসালু’-র জমিলা, ‘চাঁদের অমাবস্যা’-র আরেফ আলী এবং ‘কাঁদো নদী কাঁদো’-র সাকিনা খাতুনের মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর আদর্শ এবং সমাজ দর্শনকে রূপ দিয়েছেন।

দরিদ্র শ্রমজীবি কৃষক, জাহাজের সারেং, কুলি-মজুর, মসিজীবি কেরাণীর পাশাপাশি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর সাহিত্যে পরিস্ফুট করেছেন সেই সব নারীদের কথা যাদের

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বন্দি করে রেখেছে অশিক্ষা, রুগ্নতা এবং বহু সন্তানের জননী করে । সমাজ তাদের দেবী বলে সম্মান জানালেও চিরকাল তারা শুধুমাত্র ব্যবহৃত হয়েছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে । পুরুষ আর নারীর চিরবিভেদকে সামনে রেখে তিনি তুলে ধরেছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর লাঞ্ছিত হওয়ার চিত্র ।আমরা দেখতে পাই 'লালসালু'-তে রহিমার যন্ত্রজীবন, 'কাঁদো নদী কাঁদো'-তে খোদেজার আত্মহত্যা, সাকিনা খাতুনের সংসারের যাতাকলে পিষে যাওয়া, 'চাঁদের অমাবস্যা'-তে যুবতী নারীর ধর্ষণ এবং খুন, 'না কান্দে বুবু' গল্পে নারীর চিরায়ত দুঃখ, 'স্বপ্নের অধ্যায়' গল্পে মালেকার জীবন এবং তার চোখে দেখা নারীর জীবনের ছবি, 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পে ন-বছরের বালিকা সেলিনার গ্রামের বাড়িতে ঘুরতে এসে এক মৌলবির বিকৃত বাসনার শিকার হওয়া, 'খন্ড চাঁদের বক্রতায়' গল্পে সতীনের আগমন, 'সতীন' গল্পে চোখের সামনে করিমনের স্বামী, সংসার হাতছাড়া হওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে লেখক প্রকৃতার্থে নারীর যন্ত্রণাজর্জর জীবনকেই প্রতিভাত করেছেন। আবার একই সঙ্গে চেয়েছেন নারীরা তাদের এই বন্দিদশা থেকে মুক্ত হোক । তাই মালেকা জীবনের কঠিনতম যুদ্ধে বারবার পরাজিত হলেও স্বপ্ন দেখা ত্যাগ করে না । মাজার এবং মজিদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে জমিলা, আর গ্রামের দরিদ্র মুসলিম পরিবারের মেয়ে সাকিনা নিজের এক স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলে একজন শিক্ষিকারূপে । এসবের পাশাপাশি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একজন পিতা, একজন সন্তানের বাৎসল্যময় স্নেহকাঙাল জীবনকেও তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'জাহাজী', 'খুনী', 'পাগড়ি', 'স্তন', 'সীমাহীন এক নিমেষে' এ ধরণের গল্প। সবকিছুর পাশাপাশি সময়ের দাবিকেও তিনি অবহেলা করেননি ।এক বিশেষ সময়ে মানুষের মৌল চাহিদাগুলোর যে পরিবর্তন ঘটে যায় সে বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। তাঁর সেই সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে । তাই 'নয়নচারা', 'মৃত্যু-যাত্রা', 'মালেকা', 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'-র মত গল্পগুলোতে উঠে এসেছে দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, ভারতবিভাগ, বাসস্থান হারানোর মত যন্ত্রনার কথা। তাঁর ইংরেজি উপন্যাস 'দ্য আগলি এশিয়ান'-এ রূপকের আড়ালে উঠে এসেছে স্বভূমি পূর্ব পাকিস্তানের টালমাটাল অবস্থার কথা। মোটকথা সমাজ জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কলম ধরেছেন যখন তিনি কর্মসূত্রে অবস্থান করছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে । সেই সুবাদে পরিচিত হচ্ছেন বিভিন্ন দেশের

সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতির সঙ্গে ।আর তার ফলস্বরূপ বাঙালি পাঠক পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে এক মৌলিক রীতি ও রচনাশৈলী, যা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে অন্য সবার থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয় । অস্তিত্বের সংকট, ধর্ম নিয়ে মানুষ ঠকানোর ব্যবসা, কিংবা আপন অস্তিত্বকে রক্ষার কারণে সত্যের প্রকাশ বা রাজনৈতিকভাবে একটা দেশের মানুষের আদর্শ এবং লড়াইয়ের মূল ভিত্তিকে চিহ্নিত করতে করতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাঙালি পাঠককে দিয়েছেন এক নতুন অনুভূতির স্পর্শ ।যে অনুভূতির মহিমাতেই তিনি হয়ে উঠেছেন বাঙালির এগিয়ে চলার ইতিহাসে এক অন্যতম পথ প্রদর্শক ।যে প্রদর্শন সামাজিকভাবে, মুসলমান সমাজের অগ্রগতির প্রেক্ষিতে ,অস্তিত্ববাদী দর্শনের ক্ষেত্রে, গ্রামসমাজের অশিক্ষা দূরীকরণে, গভীরভাবে মননশীলতার ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দরিদ্র দেশের ক্রমোন্নতিতে পাথেয় হিসেবে চিরস্মরণীয় । সব মিলিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাংলা সাহিত্যের যে এক অন্যতম মাইলস্টোন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না ।

তথ্যসূত্র :

১. ওয়ালীউল্লাহ্‌ সৈয়দ, উপন্যাসসমগ্র, পৃ-১০১, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ

২. ওয়ালীউল্লাহ্‌ সৈয়দ, উপন্যাস সমগ্র, পৃ-৮৫-৮৬, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ